বর্তমান

কলকাতা, সোমবার ১৮ আগস্ট ২০১৪, ১ ভাদ্র ১৪২১

সুলেখা দেখিয়েছে ‘সদিচ্ছা’ থাকলে হয়

নথিভুক্ত শিল্পসংস্থা বন্ধ হওয়ার দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গ দেশে দ্বিতীয় স্থানে

‘গঙ্গাপ্রাপ্তি’ ঘটেছে গঙ্গাপাড়ের বহু চিমনির। বারাকপুর, টিটাগড়, হাওড়া, বর্ধমানসহ রাজ্যের বহু শিল্পাঞ্চল এখন শুধুই ইতিহাস। বন্ধ হয়েছে জুটমিল, স্পিনিং মিল, বিস্কুট কোম্পানি। বন্ধ হয়েছে বাংলার একটা সাইকেল কারকানাও।

লিখেছেন শুভজিৎ অধিকারী।

চেষ্টা আর সদ্দিচ্ছা থাকলে ঘুরে দাঁড়ানো যায়। যেমন ঘুরে দাঁড়িয়েছে সুলেখা। রাজ্যে শিল্প-কারখানার ‘অন্তর্জলিযাত্রা’র মাঝে একটুকু প্রাণের স্পন্দন।

একটা সময় সবাই ভেবেছিলেন বাংলার, বাঙালির এই শিল্পসংস্থাটি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৮৮ সালে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ফের খুলবে, এমন অর্বাচীন ভাবনা বোধহয় কেউই ভাবতে পারেননি।

সুলেখার সমসাময়িক অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে। ‘গঙ্গাপ্রাপ্তি’ ঘটেছে গঙ্গাপাড়ের বহু চিমনির। বারাকপুর, টিটাগড়, হাওড়া, বর্ধমানসহ রাজ্যের বহু শিল্পাঞ্চল এখন শুধুই ইতিহাস। বন্ধ হয়েছে জুটমিল। বন্ধ হয়েছে স্পিনিংমিল। বন্ধ হয়েছে বিস্কুট কোম্পানি। বন্ধ হয়েছে ‘সবেধন নীলমণি’ বাংলার একটা সাইকেল কারকানাও। ভ্যানিস হয়ে গিয়েছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলিও। ভগ্নপ্রায় কিছু বাড়ি আর পড়ে থাকা মরচে ধরা কিছু যন্ত্রাংশ জানান দেয়-একদা এখানকার পথঘাট মুখর থাকত শ্রমিক কোলাহলে। আজ সেখানে সবই উষর। ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের এক হিসাব বলছে, সরকারি খাতায় নথিভূক্ত শিল্পসংস্থা বন্ধ হওয়ার দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে। মহারাষ্ট্র রয়েছে প্রথমস্থানে। তথ্য বলছে, ওই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মোট নথিভূক্ত শিল্পের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৮ হাজার। তার মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৪১৬২১টি।

শিল্পের এই মন্দাদশা কাটাতে এখনই একটা সম্পূর্ণ শিল্পনীতির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলছিলেন, রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের শিল্প ছাড়া আর কোনও বিকল্প রাস্তা নেই। সরকার যে একেবারে চেষ্টা করছে না, তা নয়। শুনছি, মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন। ভালো কথা। তাঁর এই সফরে কিছু সুফল হয়তো মিলতে পারে। আমি আশাবাদী। তবে সবচেয়ে আগে যেটা প্রয়োজন তা হল, একটা সম্পূর্ণ শিল্পনীতির প্রণয়ন। যে শিল্পনীতিতে বন্ধ কল-কারখানাকে পুনর্জ্জীবিত করার দিশা থাকবে। আবার নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের পথকে সুগম করে তুলবে। জমি নীতিরও কিছুটা রদবদল করা প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

তবে এরই পাশাপাশি রাজ্যে শান্তির বাতাবরণও যে অত্যন্ত জরুরি, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন সোমনাথবাবু। তিনি বলেন, তোলাবাজির সমস্যা ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই সমস্যা সামগ্রিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটা নেতিবাচক বার্তা পাঠায় বণিকমহলের কাছে। এটাকে যে কোনও মূল্যে ঠেকাতে হবে। লগ্নিকারীদের সুস্থভাবে ব্যাবসা করার পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। এখন একটা বিষয় বেশ লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠছে, হঠাৎ কিছু শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেগুলি আবার খোলার চেষ্টা হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না, শিল্পগুলি কেন বন্ধ হচ্ছে। আবার খোলাও যে হচ্ছে, তা যে আর বন্ধ হবে না, এমন সন্দেহও মন থেকে যাচ্ছে না।

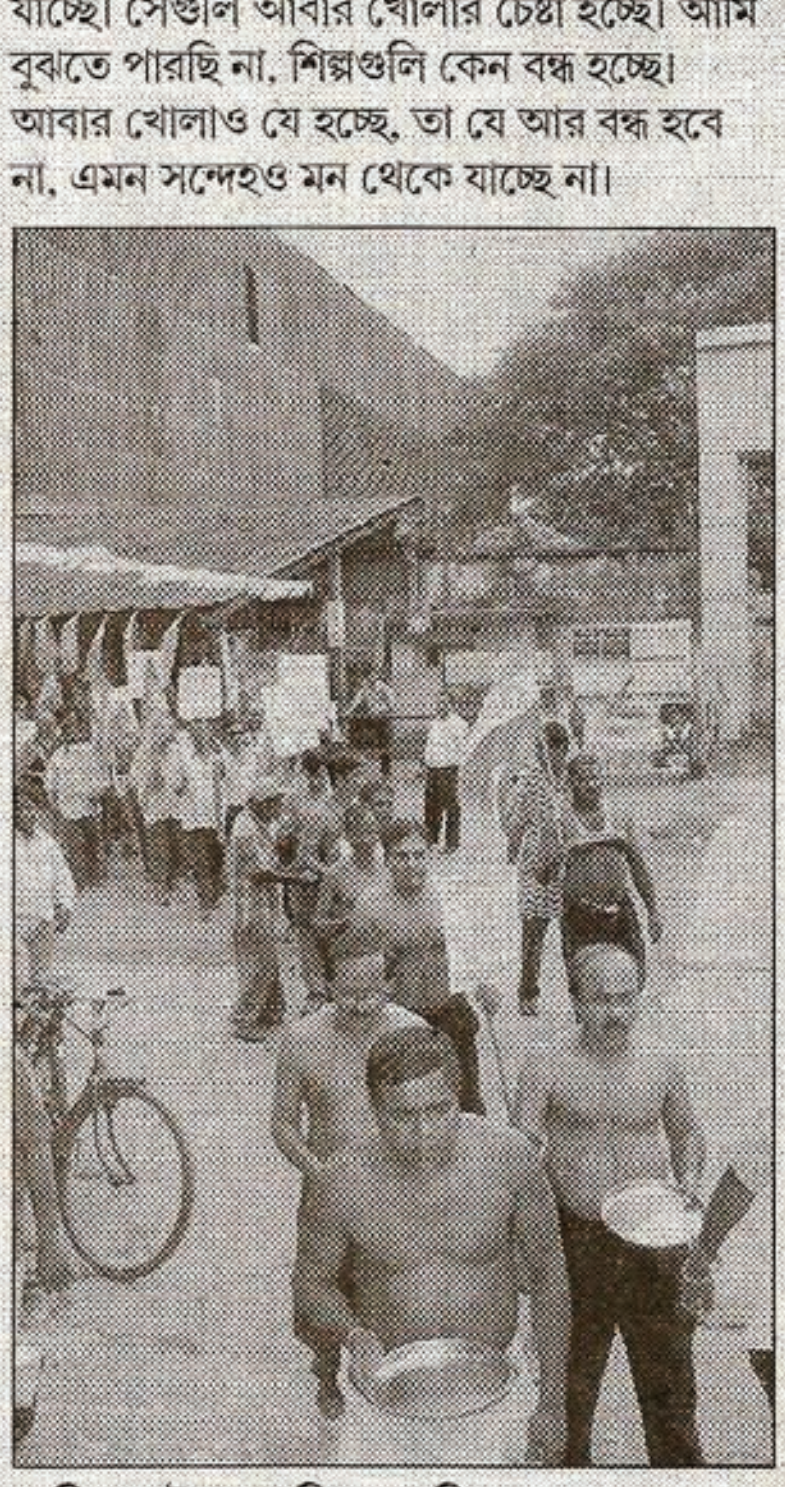

• *হিন্দমোটরের শ্রমিকদের বিক্ষোভ।*

দীর্ঘ আঠারো বছর বন্ধ থাকার পর সুলেখা যখন খুলল, তখনও রাজ্যবাসীর মনে এই সন্দেহটাই জেগেছিল। কিন্তু তা হয়নি। কিংবা বলা ভালো তা হতে দেয়নি সুলেখা কর্তৃপক্ষ।। সালটা ২০০৬। এই আট বছরে সুলেখা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য ছাড়িয়ে বাণিজ্যের ব্যপ্তি ঘটেছে ভিনরাজ্যে। এমনকী বিদেশেও। সেটা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষের চেষ্টা আর সদ্দিচ্ছার জোরে।

তাই হয়তো সুলেখার বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৌশিক মৈত্র বলছিলেন, রাজ্যে শিল্প নিয়ে হতাশার কিছু হয়নি। চেষ্টা করলে সবই সম্ভব। সেইসঙ্গে অবশ্যই থাকতে হবে সদ্দিচ্ছা। মৃত শিল্পকে বাঁচাতে এই দুটি বিষয়ই হল অন্যতম সঞ্জিবনী। বলতে দ্বিধা নেই, আমরা আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলাম বাংলার শিল্প মানচিত্রে সুলেখার হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনা। এরজন্য আমাদের অনেকটা সময় লেগেছে। পুরানো ধ্যানধারণা ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে। উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হয়েছে। প্রযুক্তির বিবর্তন ধারাকে মেনে নিয়ে পা ফেলতে হয়েছে প্রতি মুহূর্তে। মোদ্দা কথা হল, ১০০ বছরের পুরানো চিন্তাভাবনা আজকের দিনে অচল। বিশেষ করে শ্রমনিবিড় শিল্পে তো বটেই। যে কারণে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জুটমিল। চা বাগান কিংবা স্পিনিং মিলের মতো শিল্পগুলি। কেন তা হচ্ছে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। এক্ষেত্রে অবশ্যই যেটা প্রয়োজন তা হল, ত্রিপাক্ষিক সমন্বয়। মালিক-শ্রমিক-সরকার, এই তিনের সমঝোতা কোনও শিল্পসংস্থাকে বাঁচিয়ে তুলতে অত্যন্ত জরুরি।

কৌশিকবাবুর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম নেতা গুরুদাস দাশগুপ্তও। তিনি বলেছেন, কারখানায় শ্রমিকদের নায্য দাবি না মানলে অসন্তোষ তৈরি হতে বাধ্য। বিক্ষোভ, আন্দোলনের সমস্যাও তৈরি হবে। কিন্তু এইসব সমস্যা মেটাতে হবে ত্রিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে। সেটা এখন ঠিকঠাক হচ্ছে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গুরুদাসবাবু বলেছেন, শিল্প-কারখানায় এখন ফঁড়েদের রাজ বিরাজ করছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ তেমনভাবে আর নেই। ফড়েদের হাতে চলে গিয়েছে শিল্পের রাশ। ফলে সব শিল্পক্ষেত্রেই একটা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চা বাগান। চটশিল্পেও দৈন্যতা। যার প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে। ফঁড়েরাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তোলবাজি, দুর্নীতি। এবং সেটা এমন মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে যে, লগ্নিকারীদের কাছে একটা আতঙ্কের আবহ তৈরি করছে। তাঁরা বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ভয় পাচ্ছে। সরকারকে উদ্যোগ নিয়ে এসব জিনিস অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। শিল্পসংস্থায় ফড়েদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে।

শিল্প-কারখানার বন্ধ্যা পরিস্থিতি কাটাতে গুরদাসবাবুও জোর দিয়েছেন একটা সুস্পষ্ট শিল্পনীতি প্রনয়ণের উপর। তিনি বলেছেন, সবদিক খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকার একটা শিল্পনীতি গ্রহণ করুক। যেখানে পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে নতুন শিল্প স্থাপনের স্পষ্ট দিশা থাকবে। বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারি শিল্পসংস্থাগুলিকেও চালু করার পরিকল্পনা নিতে হবে। নতুন নতুন শিল্প স্থাপনেও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। আবার যৌথ উদ্যোগেও সরকারকে শামিল হতে হবে। তবেই আমাদের রাজ্যে শিল্প কারখানার হৃতগৌরব ফিরে আসতে পারে বলে আমার মনে হয়।

আশাবাদী সুলেখার কর্ণধারও। বললেন, আমরা হয়তো গুজরাত, ব্যাঙ্গালোর হতে পারব না। কিন্তু বাংলাকে দেশের শিল্প মানচিত্রের মধ্যে একটা জায়গা অন্তত করে দিতে পারব। শুধু চাই চেষ্টা আর সদ্দিচ্ছা।